# শিব্রাম রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনায়

শিবরাম চক্রবর্তী

বলে গেছেন উপনিষদ
আরাম নাহি অল্পে।
বাড়ি-শুদ্ধ সবার আমোদ
শিবরামের গল্পে।।

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

হে শিবরাম চক্রবর্তী
হে অমর হর্ষবর্ধনের স্রষ্টা,
তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হয়
কিন্তু কোমরে বাত
অসমর্থ,
যেতে পারি না।
তবু যাব একদিন চেষ্টা করে।
তোমার সম্বর্ধনা-সভায়
এই কারণেই উপস্থিত থাকতে পারিনি।
এ দুঃখ মর্মান্তিক হয়ে আছে।
ছেলেদের বই দিলাম।
অজস্র প্রেম নাও
ও বিতরণ কর।

শুভার্থী
বলাইদা (বনফুল)

সার্কাসের ক্লাউন যেমন। সব খেলাতেই ওস্তাদ, কিন্তু তার দক্ষতা খেলো দক্ষতার ভাঁড়ার। সব খেলাই জানে, সব খেলাই সে পারে, কিন্তু পারতে গিয়ে কোথায় যে কী হয়ে যায়, খেলাটার হাসিল হয় না; হাসির হয়ে ওঠে। আর হাসির হলেই তার খেলা হাসিল হয়।

কিন্তু আমি তা পেরেছি কি!

শিবরাম চক্রবর্তী

# ভূমিকা

বয়সোচিত অসুস্থতার হেতু, দুঃখের বিষয় লেখকদেরও অন্তিম কাল আসে—, বার্ধক্য তাদের ক্ষমা করে না—তার বশে যথোচিত নজর দিতে না পারায় আমার রচনাবলির এই খণ্ডটি আড়ে বহরে তেমন বাড়তে পারেনি। তবুও আমার স্নেহের ভাগনে শ্রীমান গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার বইয়ের প্রকাশক-এর সযত্ন প্রয়োগ-নৈপুণ্যেই মোটের উপরে পুজোর আগে, একটু দেরি হলেও প্রায় যথাসময়েই বইটি বেরুতে পারল, সেজন্য এর তাবৎ কৃতিত্ব তার এবং যা কিছু ধন্যবাদ তারই প্রাপ্য। আর, এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের সব ত্রুটি বিচ্যুতি একান্তই আমার। আমার পাঠক-পাঠিকারা এটা সম্ঝে নিজগুণে মার্জনা করে নেবেন আমি আশা করি।

# সূচিপত্র


◎ বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত্বপ্রাপ্তি ৯
◎ নাকে ফোড়ার অনেক ফাঁড়া ১৭
◎ থাতিয়েকান্তর চালের আড়ত ৩২
◎ থাতিয়েকান্তর অ্যাসেট ৪৩
◎ ধূম্রলোকে হর্ষবর্ধন ৫০
◎ কাকাবাবুর কাণ্ড ৫৭
◎ ডিটেকটিভ শ্রীভর্তৃহরি ৮৩
◎ রাজা হবার সোজা রাস্তা ৯৫
◎ জন্মদিনের উপহার ১০১
◎ অথ আয়োডিন-ঘটিত ১০৭
◎ আস্তে আস্তে ভাঙো ১১৪
◎ হাওড়া-আমতা রেললাইন দুর্ঘটনা ১২৪
◎ পড়শির টান! ১৩৬
◎ মাসতুতো ভাই ১৪০
◎ অশ্ব থেকে অশ্বতর ১৪৪
◎ সভ্য হওয়ার— নানান ফ্যাচাং ১৪৯
◎ চটির সঙ্গে চটাচটি ১৫৫
◎ শিক্ষাদান ১৬২
◎ মন্টুর গোয়েন্দাগিরি ১৬৮
◎ খেলার ঠেলা ১৭৪
◎ সমগোত্র ১৮১
◎ সত্যবাদিতার পুরস্কার ১৮৬
◎ পেটের কামড় ১৯৪
◎ রোগ দু রকমের ২০২
◎ পুরস্কার-লাভ ২১১
◎ ইতুর থেকে ইত্যাদি ২১৮
◎ চকরবরতিরা কঞ্জুস হয় ২৫৪
◎ তৃতীয় কাণ্ড ২৭৮
◎ মধুচক্রান্ত ২৯৬
◎ ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ৩০০

# বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত্বপ্রাপ্তি

পটল আর কদিন খাওয়া চলে? ওই পৌষমাসের গোড়ার কদিনই যা! হ্যাঁ, ওই প্রথম উঠতির মুখেই, যা এক-আধটা পটল-ভাজা মুখে তোলা যায়। কিন্তু কদিনই বা পটলের দর থাকে? ষোলো টাকা হতে না হতে চার টাকায় নেমে গেছে, আর, চার টাকা থেকে, দেখতে না দেখতে, একেবারে চার-চার আনা সের সটান!

তারপর আর পটল খাওয়া পোষায় না।

অন্তত বিশ্বপতিবাবুর পোষায় না। রামাশামা যদুমধু যে-ই চার আনা ফেলতে পারে, সে-ই যখন পটল তুলতে পারে, তখন আর তাঁর পটলে রুচি থাকে না, পটলের উপর থেকে তাঁর চিত্তই চলে যায়; তাঁর লোলুপতা লোপ পেয়ে, পটল-ভীতিই জাগতে থাকে তখন। রীতিমতোই জাগতে থাকে।

পটলের সাধারণ-তন্ত্রে তাঁর উৎসাহ নেই। বাজারে পটলের দর গেল, তো, বিশ্বপতিবাবুর কাছে তার আদরও গেল।

সেদিন সাহেব পাড়ায় ইউয়িং কোম্পানির দোকানে জামাটা করিয়ে অবধি মনটা ওঁর ভালো নেই। প্রাণের মধ্যে কেমন যেন খচখচ করছে—সত্যি, ওহেন দুর্ঘটনার পর, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো আর মানেই হয় না, জীবন-ধারণের আনন্দই তাঁর অন্তর্হিত হয়েছে সেদিন থেকে।

অমন যে ইউয়িং কোম্পানি, কতবার ওখানে জামা করিয়েছেন, কত ডজনই তো করিয়েছেন, সেখানে কিনা এবার পঞ্চাশ টাকা গজের উপরে সার্জই নেই। বরাত মন্দ আর বলে কাকে? এই তো গেল শীতেও, দুশো টাকা গজের ভিনিসিয়ান সার্জ পেয়েছেন, পিকক রঙের এবং কত সব তোফা ডিজাইনের,—কিন্তু এবার কী দুঃসময় পড়েছে, দ্যাখো দিকি? পঞ্চাশ টাকা গজের সস্তা খেলো কাপড়ে কখনাই বা জামা করানো যায়? বা করতে সাধ হয় মানুষের? আর সে-জামা গায়ে দিয়ে কি বাইরে বেরুনোই চলে? কোনোরকম দায়সারা-গোছ ঘরে পরে বসে থাকা ছাড়া গতি কী? একেবারে ঘর-জামাই হবার গতিক!

কারা যে আগে এসে তাঁর উপরে টেক্কা মেরে গেছে, টের পাচ্ছেন না বিশ্বপতিবাবু। নেটিভ স্টেটের রাজারাই কিনা কে জানে! কিন্তু মনটা ওঁর খুঁত খুঁত করছে সেদিন থেকেই।

কিন্তু যখন তিনি দেখতে পান, তাঁর আলাপীদের অনেকে, তিন টাকা গজ সার্জের

শার্ট করিয়েই আহ্লাদে আটখানা, তখন আর তাঁর বিস্ময়ের অবধি থাকে না। নিশ্চয় ওরা চার আনা সেরের পটলও খায়। হ্যাঁ, তিনি ঠিকই ধরেছেন। এমন কী জিজ্ঞাসাবাদে এও জানা যায়, ও-জিনিস চার পয়সা সের হলেও ওদের মুখে তুলতে বাধে না। এত সস্তার পটল খেয়ে কী করেই যে টিকে থাকে সেই এক আশ্চর্য, আর—আর কেনই বা খায়? ভেবেই থই পান না তিনি, বাস্তবিক কী ভয়ানক টেকসই এরা! যতই ভাবেন ততই বিস্মিত হন বিশ্বপতিবাবু।

সত্যি, এত বিস্ময়জনক বস্তুও আছে এই পৃথিবীতে! চার আনা সেরের পটলও খায়, চার টাকা গজের জামাও গায়ে দ্যায়! অদ্ভুত! বিশ্বপতিবাবু ভেবেই কাহিল হয়ে পড়েন, ভাবতেই তাঁর গায়ে কাঁটা দ্যায় কীরকম।

আসল কথা বলতে কি, সস্তার কিস্তিতেই তো তিনি মাত হবার দাখিল! আক্রা জিনিসের অভাবেই বেজায় কাবু হয়ে রয়েছেন বলতে গেলে! দামি জিনিস, বেশি কই আর বাজারে? অথচ এই সব সস্তা আর খেলো জিনিস নিয়েই তো হেসেখেলে চলে যাচ্ছে দুনিয়ার! এবং ব্যবহার করে সবাই বেঁচে বর্তে আছেও তো বেশ। ভাবেন আর অবাক হন বিশ্বপতি।

এহেন বিশ্বপতিবাবুর বরাতে বোধ করি আরো বিস্ময়ের ধাক্কা লেখা ছিল। তা নইলে একদা বিকেলে, গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে গিয়ে তাঁর মোটরের কলই বা বিগড়োবে কেন হঠাৎ?

বছর-পুরোনো গাড়িখানা বদলে কদিন আর এটাকে কিনেছেন! নাইনটিন থারটি নাইনেরই মডেল! কিন্তু সেই বস্তুই যে বলা নেই কওয়া নেই, বদমাইশি শুরু করবে, কে আর জানে বলো! বিরক্ত হয়ে বিশ্বপতি গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন। বিড়ম্বনা আর বলে কাকে!

শোফার বলেছে: "পেছন থেকে একটু ঠেললে বোধহয় গাড়িটাকে চালু করা যায়! কিন্তু আমার—আমার একার দ্বারা কি হবে?"

ইঙ্গিতটা সে ইশারাতেই সারে।

কিন্তু বিশ্বপতিবাবুর মনে কোনো 'কিন্তু' নেই, তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন: "না বাপু, ও-সব ঠেলাঠেলি-কর্ম আমার না। গায়ে অত জোর নেই আমার। চার আনা সেরের গোঁয়ার পটোলখোর্‌রাই পারে মোটর ঠেলতে। আমি পারব না বাপু। তুমি বরং তার চেয়ে—"

এই পর্যন্ত বলে তিনি পকেট থেকে গ্রিন্ডলে ব্যাঙ্কের খুদে চেক বইটা বার করেছেন এবং ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের আরেকটা এবং তাঁর দামি পার্কার-কলমে এক একটা মোটা অঙ্ক লিখে, দুখানি পাতা বৃন্তচ্যুত করে শোফারের হাতে দিয়েছেন:

"—যাও, এই নিয়ে দ্যাখো গে সাহেব-কোম্পানিগুলোয়। ডজ্ হয়, শেভরলে হয়, বুইক্ হয়—যা হয় আপাতত একটা কিনে আনো গে পছন্দ মতন। আমি এধারে হাওয়া খাচ্ছি—বেড়িয়ে-বেড়িয়েই হাওয়া খাচ্ছি ততক্ষণ।"

ট্রামে করে, রিকশায় কিংবা ফিটনে, এমনকী ট্যাকসি চেপেও, বাড়ি ফেরার কথা,

ঘুণাক্ষরেও তাঁর মনে হয়নি। রিকশা ইত্যাদি তো ধর্তব্যের মধ্যেই না, তবে দায়ে পড়ে ট্যাকসিতে দু একবার চাপতে হলেও, ট্রামে তিনি জীবনে কখনো পদার্পণ করছেন কিনা সন্দেহ। কী করে যে অত লোক একটা মাত্র কামরায় কামড়াকামড়ি করে যায়! কামড়া-কামড়ি না হলেও গুঁতোগুঁতি তো বটেই! কিছুতেই তা তিনি ভেবে পান না। আর ট্যাক্সি মিটারের আট আনা মাইল, ভাবতেই তো তিনি কাহিল হয়ে পড়েন! মাত্র আট আনা! বাড়ি পৌঁছতে তাঁর দেড় টাকাও হয়তো পড়বে না—ছি ছি, লোকচক্ষের সমক্ষে চক্ষুলজ্জার চরম!

যাক্‌গে! ততক্ষণ হাওয়াই খাওয়া যাক। প্রথম শীতের পড়ন্ত রোদের সঙ্গে শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়া বেশ মিষ্টিই লাগে! কিন্তু অত সস্তা দামের জামা গায়ে, পাছে কেউ দেখে ফ্যালে, এই যা তাঁর আশঙ্কা! গরিব লোক বলে গণ্য হতে, অপরের অবজ্ঞা-ভাজন হতে অত্যন্তই তিনি নারাজ!

হাওয়াগাড়ি করে বেড়ানই চিরদিনের অভ্যাস, বেড়িয়ে হাওয়া খাওয়ার দূরদৃষ্ট এই তাঁর প্রথম। বেড়াতে বেড়াতে কেবলি তাঁর মনে হয়, এ কী করছেন! নিতান্তই নিজের পায়ের উপর নির্ভর করছেন অবশেষে? এটা কি খুব ভালো হচ্ছে? নিজের কাছেই বিশ্বপতি কেমন যেন সলজ্জ হয়ে পড়েন। নিজেকে নিঃস্ব ভাবেন অতি মনে মনে।

ক্রমশ, প্রতি পদেই নিজের কাছে তাঁকে সাফাই গাইতে হয়। কেন? মোটর না হল তো কী হল? সবাই কি মোটরে করেই হাওয়া খাচ্ছে? বেড়িয়ে বেড়িয়ে কি হাওয়া খাওয়া যায় না? খায় না কি মানুষ? খেতে কি নেই? কী হয় খেলে? আর, যদি তিনি খানই কে তাঁকে আটকাতে পারে, তাঁর সেই আহারে বাধা দিতে পারে, শুনি? না না, বেড়ানোর হেতু তাঁর তেমন কিছু অসুবিধা নয়, কেবল ওই একটা যা-তা জামা তাঁর গায়ে কিনা, সেই জন্যই যা—!

তবে তাঁর বরাত ভালো! মাঠের ও-ধারটায় দুটি ছোট্ট ছেলে আর মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না। কেবল তারাই দুজনে খেলা করছিল। হুটোপাটি করে ছুটোছুটি করে লুটোপুটি করে খেলছিল নিজেদের মধ্যে।

না, সন্দিগ্ধস্বভাব কোনো ব্যক্তি—এমনকী ভদ্রলোক বলে সন্দেহ করা যেতে পারে এমন কোনো প্রাণীরই সে-অঞ্চলে প্রাদুর্ভাব নেই! বিশ্বপতিবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করলেন—আঃ!

কিন্তু কতক্ষণেরই বা স্বস্তি! দেখতে না দেখতে, টুনু লাফিয়ে এসেছে তাঁর কাছে ঃ "দাও তো তোমার ফাউন্টেনটা!"

ঈষৎ ইতস্তত করে বিশ্বপতিবাবু কলমটা হাতছাড়া করেছেন।

নেড়ে চেড়ে দেখে টুনু বলেছে ঃ "এর চেয়ে আমার ফাউন্টেনটা ঢের ভালো। কেমন রঙচঙে সেটা। বড়দা দিয়েছিল আমায়। বা-রো আ-না দাম! বুঝলি রে বেণু, বারো আনা?"

বেণু এগিয়ে আসে বিশ্বপতিবাবুর কাছে ঃ "আমার কপালে একটা টিপ এঁকে দাও।"

উপু হয়ে বসে—হ্যাঁ, সেই ধুলো-মাটির উপরেই, ঘেসো জমির কোল ঘেঁষে উপ্‌ হয়ে বিশ্বপতি টিপ্‌ আঁকার দুঃসাধ্য কর্মে ব্রতী হন। আশ্চর্য কাণ্ডই বটে!

"আর গোঁফ করে দাও আমার।" গুম্ফ-লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা টুনুর। এক নিশ্বাসে বড়ো হবার দুরভিসন্ধি।

বিশ্বপতিবাবুকে গোঁফ বানিয়ে দিতে হয়। গুম্ফলোভী ছোড়দা এবং টিপ-লুব্ধ তার ছোটো বোন দুজনেরই। যথাসাধ্য ভালো করে আঁকতেই চেষ্টা করেন, তবু তাঁর শিল্প-রচনায় খুঁত থেকে যায়, এক পাশের চেয়ে অন্য পাশের গোঁফটা বেশি লম্বা হয়ে পড়ে, একটার চেয়ে আরেকটা অধিকতর ঘনীভূত দেখায়, বিশ্বপতিবাবুর ঠিক মনঃপূত হয় না। নাঃ, তাঁর নিজের পরিপুষ্ট এবং লীলায়িত গোঁফের কাছে এসব গোঁফ দাঁড়াতেই পারে না, নিজের ঘন-সন্নিবিষ্ট সূচ্যগ্রতায় তা দিতে দিতে তাঁর মনে হয়।

কিন্তু টুনু-বেণুর কোনো বিকার নেই। ততক্ষণে তারা নতুনতর প্রস্তাব পেড়ে ফেলছে বোধকরি, বিশ্বপতি বাবুকে পুরস্কৃত করবার মতলবেই!

"তুমি ঘোড়া হও। হও না?"

গুম্ফবতী বেণুই বলেছে।

বিশ্বপতিবাবুর বিস্ময় লেগেছে। "ঘোড়া? ঘোড়া আবার কী?" শুধিয়েছেন তিনি। তাঁর ধারণা ঘোড়া নাকি হবার নয়, হলে পরে এমনি হয়।

"বাঃ ঘোড়া হতে জানো না? এই যে, এমনি করে ঘোড়া হতে হয়। হও না তুমি।"

টুনু স্বয়ং উদাহরণ স্বরূপ চতুষ্পদ সেজে, তাঁকে পথ-প্রদর্শন করতে চেয়েছে।

"কেন? ঘোড়া হতে যাব কেন?" বিশ্বপতিবাবুর তথাপি বিস্ময় যায়নি।

"বাঃ আমরা চাপব যে! চাপব তোমার পিঠে।" বেণুর সরল স্বীকারোক্তি।

বিশ্বপতিবাবু কিন্তু বিব্রত বোধ করেছেন—হ্যাঁ, একটু বিব্রতই! অবশ্য, উপু যখন হতে পেরেছেন, তখন ঘোড়া হওয়া আর বেশি কি, খুব সুদূর-পরাহত ছিল না সত্যিই,—তেমন কল্পনাতীত কাণ্ড কিছু নয়তো! তথাপি বিশ্বপতিবাবু গ্রীবা বক্র করে মৌন অসম্মতি জানিয়েছেন— ঘোড়াদের যেমন চিরকেলে দস্তুর!

জানোয়ারদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করা টুনুর স্বভাবসিদ্ধ নয়। সে তাঁর পিঠে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং বেণু ঠিক তার পিঠোপিঠি। কাজেই চতুষ্পদে পরিণত হবার যেটুকু মাত্র বাকি ছিল, এ-হেন পৃষ্ঠ-পোষকতার ধাক্কায় তার আর বিলম্ব থাকে না।

তারপর মহাসমারোহে, হেই—হেট্‌—হুশ-হাশ করে—তারা তাঁকে চালিয়ে নিয়ে ফিরেছে। যদিও তাঁর নিজের ধারণায়, তিনিই চালিয়ে নিয়ে চলেছেন তাদের। বলা-বাহুল্য, এই পরিচালনা ব্যাপারে, কী আসল আর কী ভেজাল, সব ঘোড়ারই ধারণা একেবারে একরকম। এবং দস্তুরমতো বদ্ধমূল।

অশ্বত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুলকিত হননি বিশ্বপতি; এমনকী, তিনি যে পদমর্যাদায় বর্ধিত হয়েছেন, এহেন সন্দেহও তাঁর মনে উদিত হয়নি, কিন্তু টুনু, যখন লাগামের অভাবে, এবং বোধ করি, নাগালের মধ্যে পেয়ে, একান্ত অসহায় পেয়েই, তাঁর লীলায়িত বিলাসিতায়, তাঁর পরিপুষ্ট গোঁফের দুই সীমান্ত প্রদেশে হস্তক্ষেপ করতে চাইল, তখন

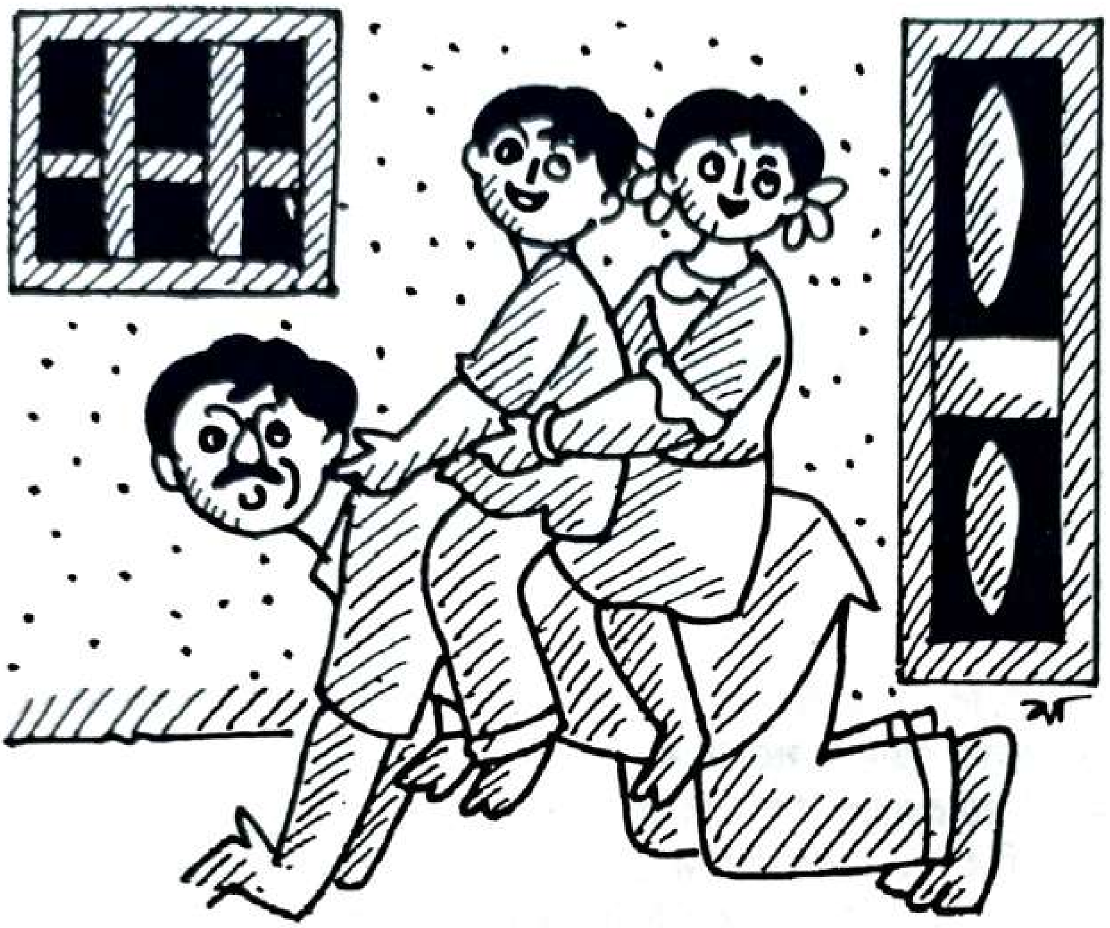

তিনি সত্যিই ভারী বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ঘাড়-ঝাঁকি দিলেন, স্কন্ধ-বিন্যস্ত কাল্পনিক কেশরদের মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টির চেষ্টা করলেন—কিন্তু সমস্তই বৃথা! টুনু বেজায় মুক্তহস্ত এবং তাঁর গো-বেচারা গোঁফ দুটি একেবারেই বেহাত হবার দখিল! অগত্যা তাঁকে হ্রেষাধ্বনি করতে হল। স্বভাবতই, এরকম অবস্থায়, না করে তিনি পারেন না।

কেন যে শিশুপালের প্রতি মনে মনে তাঁর ভীতি ছিল, এখন বুঝতে পারলেন বিশ্বপতিবাবু। কেন যে সেই মর্মান্তিক ভয়ের বশবর্তী হয়ে এতদিন বিয়ে পর্যন্ত করবার তার দুঃসাহস হয়নি, তাও এখন তাঁর হৃদয়ঙ্গম হল। হ্যাঁ, এইজন্যেই তিনি নিজের বিয়ে দিতে পারেননি এতদিন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যে এতদূর মারাত্মক হতে পারে, এতখানি তাঁর ধারণার বাইরেই ছিল। অথচ, এমন একআধটা নয়—কত গণ্ডা, কত লক্ষ গণ্ডাই এ জাতীয় দুর্বহ ভার পিঠের উপর নিয়ে পৃথিবীকে চলতে হচ্ছে। পৃথিবী যে কী করে সঠিক চলছে, সেইটাই আশ্চর্য ঠ্যাকে বিশ্বপতির!

হ্রেষা-ধ্বনিতে ঘাবড়াবার ছেলে নয় টুনু। এমন কত দুষ্টু ঘোড়াকেই সে শায়েস্তা করেছে অনতিদীর্ঘ জীবনে। উক্ত হ্রেষা-রবে সেই পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরুক্তি শুনতে পায়। গোঁফ ছেড়ে দিয়ে সে বিশ্বপতির কান পাকড়ে ধরে।

এবার অশ্ববরের অসহ্য হয়ে পড়ে। ভারি এবং ভরাট গলায়, ভারিক্কি চালের তিনি গগনভেদী এক চি হি হি ডাক ছাড়েন। সমুচ্চ কণ্ঠে তাঁর প্রতিবাদ ঘোষণা করেন। এবং উৎকণ্ঠাও।